"সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠা ও "শ্রীভূমি" পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট

১৫ নভেম্বর ২০২০

অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য

সুরমা উপত্যকার প্রথম সাহিত্য সংগঠন 'সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী'। সাহিত্য চর্চার পরিসর বিস্তৃত হলেই সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 'সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন' (Surma Valley Political Conference) এর জলসুখা অধিবেশনে (১৯০১) 'সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী' গঠিত হয়েছিল। শিলচর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুরমা'র ২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৪ খ্রি:, সোমবার সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে জলসুখার 'সুরমা ভ্যালি কনফারেন্সের' ভাঙ্গা আসরে একটি 'সাহিত্য বৈঠক' বসিয়াছিল। ইহাই সুরমা উপত্যকার আদিম সাহিত্যিক সভানুষ্ঠান। এ অঞ্চলের 'মজলিসি' ভাবে সাহিত্যালোচনার এই হইতেই সুত্রপাত ।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় সিলেট-কাছাড়ে বয়কট কর্মসূচি সফল করার ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের স্বাদেশিক চেতনাকে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সাংগঠনিক রূপ দিতে নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে যে সব সভা-সমিতি গঠিত হয়েছিল সেগুলিকে একত্রিত করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১৯০৬ খ্রি: গঠিত হয় 'সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন' (Surma Valley Political Conference)। বিভিন্ন সময়ে উক্ত সম্মেলনের নয়টি অধিবেশন হয়েছিল। অধিবেশনগুলির বিবরণ নিম্নরূপ—

অধিবেশনের স্থান ও সময়	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি	অধিবেশন সভাপতি	বক্তা
প্রথম অধিবেশন তেলীহাওর। (হেমেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি।) ১১, ১২ আগস্ট, ১৯০৬	রাধাবিনোদ দাস	কামিনীকুমার চন্দ	বিপিনচন্দ্র পাল। প্যারীলাল সোম মৌলবী মছদ্দর আলী।
দ্বিতীয় অধিবেশন করিমগঞ্জ, খলাছড়া (রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাসের বাড়ি।) ১১৮-২০ এপ্রিল, ১৯০৮	পবিত্রনাথ দাশ	রাধাবিনোদ দাস	বিপিনচন্দ্র পাল
তৃতীয় অধিবেশন জলসুখা (বৈকুণ্ঠনাথ দাসের বাড়ি) ১৯০৯	বৈকুণ্ঠনাথ দাস	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	অরবিন্দ ঘোষ। (ঋষি অরবিন্দ)

© Ishan Kotha

চতুর্থ অধিবেশন করিমগঞ্জ (নীলমণি রোড ক্লাব কম্পাউন্ড) মার্চ, ১৯	সতীশচন্দ্র দেব	বিপিনচন্দ্র পাল	সুন্দরীমোহন দাস৷ মৌলানা সৌকত আলী হরদয়াল নাগ৷
পঞ্চম অধিবেশন সিলেট টাউন হল প্রাঙ্গণ ১৯, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০	জয়নারায়ণ দেব	মৌলবী আব্দুল করিম	সুন্দরীমোহন দাস মৌলনা আক্‌রম খাঁ অখিল চন্দ্র দত্ত
ষষ্ঠ অধিবেশন সুনামগঞ্জ নদীতীর প্রাঙ্গণ ২২ আগস্ট, ১৯২৪	ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	সরোজিনী নাইডু	শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ক্ষীরোদচন্দ্র দেব
সপ্তম অধিবেশন হবিগঞ্জ টাউন ১৯২৭	শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস	দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	শরৎকুমার ঘোষ সন্তোষ কুমারী গুপ্ত বসন্তকুমার মজুমদার
অষ্টম অধিবেশন সিলেট টাউন হল প্রাঙ্গণ ১ জুলাই, ১৯২৮	বসন্তকুমার দাস	সুন্দরীমোহন দাস	বাবা গুরুদিৎ সিং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হরদয়াল নাগ
নবম অধিবেশন সিলেট মণিপুরি রাজবাড়ি ২৭ জুন, ১৯৩২	হাজি মতছিম আলী	দুর্গাকুমার গুপ্ত	শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

জলসুখা গ্রামে অনুষ্ঠিত ‘সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন’ এর তৃতীয় অধিবেশনের ‘ভাঙ্গা আসরে’ আয়োজিত ‘সাহিত্যিক বৈঠকে’ গঠিত হয়েছিল ‘সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী’৷ এ প্রসঙ্গে জরুরী প্রশ্নটি হল—রাজনৈতিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা একটি সাহিত্য সংগঠন স্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কেন?

এর কারণ একাধিক—প্রথমত, সুরমা উপত্যকায় সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক ঐতিহ্য; দ্বিতীয়ত, অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক পরিচিতি বিষয়ক বিতর্ক, তৃতীয়ত, বঙ্গ সংস্কৃতির পূর্বপ্রান্তীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাহিত্যচর্চার নিদর্শন বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করা৷

সুরমা উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সব ক’টি প্রধান ধারাই এখানে বিকশিত হয়েছিল৷ উনিশ শতকের যুক্তিবাদী চেতনার তরঙ্গ এই প্রান্তীয় অঞ্চলের তটভূমিকেও স্পর্শ করেছিল৷ শুধু শিক্ষিতজনই নয়—উনিশ শতকের মানবিক ভাবনা গ্রামীণ মানুষকেও

(C) Ishan Kotha

উদ্দীপিত করেছিল৷ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিঃ বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়৷ বিধবা বিবাহ নিয়ে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কথা সুবিদিত৷ লক্ষণীয় বিষয় হল, সুরমা উপত্যকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত হয়েছিল লোকনৃত্য 'ধামাইলের' গান৷ গানে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে৷ যেমন—

ধইন্য ত্রিপুরার জিল্লায়
এ গ দেশে দেশে প্রচার অইছে বিধবার বিয়ার
মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গেতে জলভরাতে যায়
এ গ জলভরাতে যায়৷
এ গ কাঙ্কের কলসী ভূমে থইয়া মাইয়ারে বুজায়
মইৎসে মাংসে খাইবায় জি গ থাকবায় পরম সুখে
এ গ অস্তে দিবায় শাখার চুড়ি জুড়মল দিবায় পায়৷...

(সংগ্রাহক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য)

নব জাগরণের প্রভাবে শিক্ষিত সমাজ মনোনিবেশ করেছিলেন গ্রন্থ রচনায়৷ কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানের গদ্যানুবাদ 'পুরাণবোধোদ্দীপনী' (১৮২৭); প্যারীচরণ দাসের কাব্য 'মিত্রবিলাপ' (১৮৭০), 'পদ্যপুস্তক' (১৮৭৬), 'ভারতেশ্বরী' (১৮৭৭); রামকুমার নন্দী মজুমদারের 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' (১৮৭২); হারাণচন্দ্র রাহার উপন্যাস 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬); শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'ভারতের সুখস্বপ্ন নাটক' (১৮৭৫), কাব্যগ্রন্থ 'মহাপূজা' (১৮৮১), 'চিতোরের বীরগান' (১৮৮৩), 'সুরেন্দ্র কারাবাস' (১৮৮৩), 'দেবীযুদ্ধ' (১৯০০); রাজীবলোচন দাসের 'পদ্যপ্রসূন' (১৮৭৮), রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের 'বিলাত রঞ্জিনী', 'তরণি নির্বাণ', 'দ্রৌপদী সন্তাষ'; বিপিনচন্দ্র পালের উপন্যাস 'শোভনা' (১৮৮৪); মহিলা কবি কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরীর 'নারীমঙ্গল' (১৮৯৪) ইত্যাদি উনিশ শতকের রচনা৷ এই সৃজনশীল পরিমণ্ডলকে সংহত করে আঞ্চলিক সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন এবং লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে সাহিত্য সংস্থা গঠন ও পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল৷ ১৩১১ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে "সুধীজনের উপস্থিতিতে শ্রীহট্টে 'সাহিত্যানুশীলনী সভা' স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়৷ 'অনুশীলনী' নামে সভার মুখপত্র মাসে মাসে প্রকাশ করার প্রস্তাব নেওয়া হলেও এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি কোনো অজ্ঞাত কারণে৷" এর পাঁচ বছর পর সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়৷ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা ছিল শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর৷ তৎকালীন বেশ কয়েকটি সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল৷ ১৯০১ খ্রি: অনুষ্ঠিত রাজশাহী সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন৷ সাহিত্য সংগঠনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সূত্রে সুরমা উপত্যকায় এ ধরনের একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন৷ 'সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনের' জলসুখা অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগী সুধীজনদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে 'সাহিত্যিক বৈঠক' আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী'৷ এজন্যই 'সুরমা' পত্রিকার (২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৪ খ্রি:) সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ১৯১২ খ্রি: অনুষ্ঠিত 'সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীর'র করিমগঞ্জ অধিবেশন সুরমা উপত্যকার 'দ্বিতীয় সাহিত্যিক অনুষ্ঠান' তবে 'প্রথম সভাধিবেশন'৷

সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ঐ সময়েই সুরমা উপত্যকায় শুরু হয়েছিল আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও ইতিহাসচর্চা৷ এই ধারার আদি গ্রন্থ মৌলবি মহাম্মদ আহমদ এর 'শ্রীহট্ট দর্পণ'৷ কলকাতা থেকে ১৮৮৬ খ্রি: প্রকাশিত 'শ্রীহট্ট দর্পণ' বাংলা ভাষায় লেখা সিলেট অঞ্চলের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত৷ ক্ষুদ্রায়তন এই গ্রন্থটি মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ৷ খান বাহাদুর হামিদ বখত মজুমদার উর্দু ভাষায় 'আইন-ই-হিন্দ' নামে একটি সুবৃহৎ প্রামণিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন৷ "মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ এই বিশাল গ্রন্থের প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণে আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট সম্পর্কিত অংশের আংশিক অনুবাদ করেন৷"২ পরবর্তী সময়ে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য দেশজ ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন৷ উইলিয়াম ক্রুক সুরমা উপদ্যকার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সিলেটের তৎকালীন জেলা শাসক এ পোর্টিয়সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷ জেলাশাসক এ.

পোর্টিয়স সিলেট কাছাড়ের স্কুল ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে পদ্মনাথ লিখেছেন, "সুপ্রসিদ্ধ ডা: (পশ্চাৎ সময় জর্জ) গ্রীয়ারসন তখন সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে (Linguistic Survey of India) এবং ইউ পি. প্রদেশের ক্রুকস্ নামক একজন সিভিলিয়ান ভারতের প্রচলিত লোকাচার (Folklore of India) সম্বন্ধে প্রতি জেলার তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। শ্রীহট্টে তত্তদ্বিষয়ক তথ্য সঙ্কলন ভার পোর্টিয়স সাহেব আমার উপর অর্পণ করেন।"৩ এ সম্পর্কে পাদটীকায় তিনি আরও লিখেছেন, "এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আমাকে অনেক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, শিক্ষক ও মৌলবীর নিকট প্রশ্ন পাঠাইয়া উত্তর আনাইতে হইয়াছিল... এই ব্যাপারে স্বদেশের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে আমার 'হাতেখড়ি' হইয়াছিল,—পরিণাম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।"৪ 'পরিণাম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'—এই বাক্যটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

উইলিয়াম ক্রুকের গবেষণার পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজ জেলার ইতিহাস অধ্যয়নে পদ্মনাথ আগ্রহয় হন এবং নির্দিষ্ট কিছু তথ্য প্রেরণের অনুরোধ করে জনসাধারণের উদ্দেশ্য একটি মুদ্রিত প্রপত্র প্রচার করেন (১৫ আশ্বিন, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। প্রপত্রের সঙ্গে প্রেরিত চিঠিতে পদ্মনাথ লিখেছিলেন "আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের এই একটা অতিশয় অগৌরবের কথা যে তাহারা স্বদেশের কাহিনী কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। কোনও কোনও ব্যক্তির আবার এইরূপ মতও আছে যে এদেশে এমন কিছুই নেই যাহা জানিবার উপযুক্ত। এইরূপ অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্যের মূল আমাদের জড়তা এবং ইহার ফল আমাদের অবশ্যম্ভাবী অধোগতি। আমরা যে দেশে জন্মিয়াছি তাহা মহিমান্বিত, এই চিন্তাটুকু মনে আসিলেও ??? আশায় স্ফীত হয়। সমগ্র ভারতভূমির চিন্তা করা অস্মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতায়ত্ত নহে, তাই ক্ষমতায় যতদূর কূলায়, আপন জিলার কাহিনী সংগ্রহ নিমিত্ত বাসনা করিয়াছি, জানিনা ভগবতী সেই বাসনা কতদূর পূর্ণ করিবেন। আপাততঃ ঐ বিবরণ সংগ্রহের নিমিত্ত আপনার নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা যে আপনারা জন্মস্থান যে পরগণায় সেই পরগণা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের বিবরণীয় যতদূর পারেন সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন।"৫ এই চিঠি হস্তগত হবার পর অচ্যুতচরণ চৌধুরী পদ্মনাথকে জানান, তিনি ইতিমধ্যে 'শ্রীহট্ট দীপিকা' নামে সিলেটের একটি ইতিহাস রচনা করে মুদ্রণের জন্য প্রেসে দিয়েছেন। পদ্মনাথ তাঁকে অনতিবিলম্বে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত আনার অনুরোধ করে জানান প্রপত্র মারফৎ সংগৃহীত সব তথ্যই তিনি অচ্যুতচরণকে প্রদান করবেন। কারণ নিজ জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হোক—এটাই তাঁর রচনা। অচ্যুতচরণ সে অনুরোধে সাড়া দেওয়ার দু'খণ্ডে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (পূর্বাংশ ১৯১০, উত্তরাংশ ১৯৭১) রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

কাছাড়ের ইতিহাস নিয়ে উনিশ শতকেই চিন্তাচর্চা শুরু হয়েছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিত 'শ্রীহট্টের তাম্রফলক ও কাছাড় রাজবংশাবলী' প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে (কার্তিক ১২৮৮ ও বৈশাখ ১২৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই প্রবন্ধটিই বাংলায় লেখা কাছাড়ের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম রচনা। বিশ শতকের প্রথম দশকে অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কাছাড় জেলায় আঞ্চলিক গবেষণা ও ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে শিলচর নর্মাল স্কুল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্টের প্রথম ছোটলাট ফুলার সাহেবের উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রি: শিলচর নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নির্বাচন করার জন্য ফুলার সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল করিমকে অনুরোধ করেন। মৌলবী আবদুল করিমের অনুমোদন ক্রমে নোয়াখালী জেলা স্কুলের হেডমাস্টার অঘোরনাথ অধিকারীকে শিলচর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। অঘোরনাথের নেতৃত্বে নর্মাল স্কুলের শিক্ষকরা আঞ্চলিক ইতিহাসের তথ্য সন্ধান ও সংগৃহীত তথ্যের সংরক্ষণ ও চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও অঘোরনাথ অধিকারীর পত্রালাপ হয়েছিল। অঘোরনাথ তাঁর লেখা শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ 'বিদ্যালয় বিষয়ক বিবিধ বিধান' (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠান (১০ অক্টোবর, ১৯১০)। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করে নভেম্বর মাসে অঘোরনাথকে লেখেন—

"বিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন— বিবিধ বিধান বইখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শিক্ষকদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যে মূল্যবান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাপ্রণালী জড়যন্ত্রের মত একই পন্থা ধরিয়া এক প্রণালীতেই চিরকাল চলিতে বাধ্য, ইহাই আমাদের দেশের অধ্যাপন-ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তা ছাড়া, শিশুর মনকে তাঁহারা মন বলিয়াই গণ্য করিতে চান না। এই জন্য শিশুশিক্ষা কার্য্যে কোন প্রকার যোগ্যতা বা বিবেচনা-শক্তির প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষকতার কাজ

চলিয়া আসিতেছে৷ ইহাতে যে কেবল সময় ও চেষ্টার ব্যর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, ইহাতে বালকদের বুদ্ধি বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে৷ আপনার এই গ্রন্থ পাঠে এ সম্বন্ধে যদি শিক্ষাব্যবসায়ীর মনে চিন্তার উদ্রেক করে তবে অনেক কাজ হইবে৷ ইংরজী গ্রন্থ হইতে আপনি শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের বালকদের প্রতি তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধেও আপনার সুচিন্তিত অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে৷ এ বিষয়ে এরূপ প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর দেখি নাই৷ অঘোরনাথের নেতৃত্বে নর্মাল স্কুলে শিক্ষকরা অজস্র পুথি, নানাবিধ দলিল ও ইতিহাসের অন্যবিধ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন৷ এই সংগ্রহের পরিচিতি মূলক দুটি রচনা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল৷ জগন্নাথ দেব লিখিত রচনা দু'টির নাম 'শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১৯৷৩) ও 'মহাকবি সঞ্জয়' (২৭৷২)৷ এজন্যই নর্মাল স্কুল আঞ্চলিক গবেষণায় এক অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান৷

সংস্কৃত ও বাংলায় লেখা হেড়ম্ব রাজাদের দণ্ডনীতি বিষয়ক পুথি পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৯১০ খ্রিঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়৷ 'গৌহাটি বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভা' কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি'৷ এই পর্বে কাছাড় জেলার ইতিহাসচর্চায় আর একটি স্মরণীয় নাম মণিচরণ বর্মণ৷ ডিমাসাভাষী মণিচরণ বর্মণের 'হৈড়িম্ব ভাষা প্রবেশ' গ্রন্থের সংস্করণ ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়৷ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের কোন কপি পাওয়া যায়নি৷ গ্রন্থটির দীর্ঘ ভূমিকায় আঞ্চলিক ইতিহাসের নানা তথ্য উল্লিখিত হয়েছে৷

উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ লিখিত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিঃ৷ গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩১৯) লেখা হয়েছিল, ''দেশের চারিধারে ইতিবৃত্ত-সঙ্কলন ও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে, দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই''৷

আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রসার এবং সাহিত্যচর্চায় সংবাদপত্রের অবদানও উল্লেখযোগ্য৷ 'সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী' স্থাপিত হবার সময় পর্যন্ত সুরমা উপত্যকা থেকে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক মিলিয়ে মোট আটটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েচিল৷ পত্রিকাগুলি হল—

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রথম প্রকাশের সন	প্রকাশের স্থান
শ্রীহট্ট প্রকাশ (সাপ্তাহিক)	প্যারীচরণ দাস	১৮৭৫	সিলেট
পরিদর্শক (সাপ্তাহিক)	বিপিনচন্দ্র পাল	১৮৮০	সিলেট
শ্রীহট্ট মিহির (সাপ্তাহিক)	লালা প্রসন্নকুমার দে	১৮৮৯	সিলেট
শিলচর (পাক্ষিক)	বিধুভূষণ রায়	১৮৮৯	শিলচর
শ্রীহট্টবাসী (সাপ্তাহিক)	নগেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮৯৩	সিলেট
Weekly Chronicle (সাপ্তাহিক	শশীকুমার সিংহ	১৯০০	সিলেট
শ্রীদেশবার্তা (সাপ্তাহিক)	ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব	১৯০৯	সিলেট
প্রজাশক্তি (সাপ্তাহিক)	মহেন্দ্রনাথ দে	১৯০৯	হবিগঞ্জ

সুরমা উপত্যকার সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা হয় উনিশ শতকে৷ আসামকে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ রূপে গঠন করা হয় ১৮৭৪ খ্রিঃ৷ স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল Orissa Famine Report এ প্রথম এই প্রস্তাব করেন৷ কাছাড়ে লুসাইদের (মিজো) উৎপাতের সংবাদ পেয়ে লর্ড মেয়ো ১৮৭১ খ্রিঃ ১১ ফেব্রুয়ারির কার্য বিবরণীতে প্রস্তাবটি কার্যকরী করার পক্ষে মত ব্যক্ত করে তা ফলপ্রসু করতে উদ্যোগী হন৷ ১৮৭২ খ্রিঃ ৮ ফেব্রুয়ারি পোর্টব্লেয়ারে কে আফগান জঙ্গির আকস্মিক আক্রমণে লর্ড মেয়ো নিহত হলে লর্ড নর্থব্রুক ভারতের

(C) Ishan Kotha

গভর্ণর জেনারেল তথা ভাইসরয় হন৷ তাঁর কার্যকাল ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ খ্রিঃ৷ তাঁর সময়েই সুরমা উপত্যকাকে যুক্ত করে আসামকে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ রূপে গঠন করা হয়৷ এই গঠন প্রক্রিয়ার কারণগুলি ছিল— প্রথমত, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন এত বড় ছিল যে পূর্ব ও উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রান্তীয় অঞ্চলগুলি ছিল অনুন্নত৷ দূরত্ব ও অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্তার ফলে এসব অঞ্চলে শাসন কার্য পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছিল৷ দ্বিতীয়ত, আসাম, কাছাড় ও সিলেট ছিল চা উৎপাদনকারী অঞ্চল৷ এই তিন অঞ্চলকে এক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করলে ব্যবসায়িক দিক থেকে সুবিধা হবে৷ সিলেট, কাছাড় থেকে ঢাকা বা কলকাতার তুলনায় এই নূতন প্রদেশের রাজধানী শিলঙ ছিল অনেক কাছে৷ তৃতীয়ত, আসাম থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল কম৷ রাজস্বের এই ঘাটতি পূরণের জন্য বঙ্গভাষী অঞ্চল সিলেট ও কাছাড়কে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়৷

সুরমা উপত্যকার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ অঞ্চলটির ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংযুক্তিকরণের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছিলেন৷ এ বিষয়ে সিলেটবাসীর প্রতিক্রিয়া এবং যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ‘শ্রীহট্ট প্রতিভা’ (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে লিখিত হয়েছে৷ যেমন—

গড়িতে আসাম রাজ শ্রীহট্টের মুণ্ডে বাজ
হানিলা নির্মম হস্তে নর্থব্রুক যবে৷
শ্রীহট্টের মর্মব্যথা বুঝি অনুভবে৷৷
আশ্বাসি বলে বচন শুন দেশবাসীগণ
তোদের বিচার বিধি প্রজাস্বত্ব যত৷
অক্ষুণ্ণ থাকিবে জেনো বাঙ্গালার মত৷৷
এখন শ্রীহট্ট হায়! কাঁদিছে দিবা নিশায়
চিরস্থ মহালের কর এলামের মত৷
বহু গুণ বাড়িয়াছে অশ্রুত অদ্ভুত৷৷
যে মহালে জমা কড়ি স্থানীয় কর দুই’শ কুড়ি
এতাধিক হইয়াছে কোনও মহালে৷
অনুস্থান কর যদি বুঝিবে সকলে৷৷
লাট পাশে আবেদন কৈলা যারা এই সন
নলিনীকান্ত দস্তিদার শ্রীকৃষ্ণসুন্দর৷
আহাম্মদ আলী খান বেরিস্টার বর৷৷
রাধিকারঞ্জন গিরীন্দ্র গোপীকৃষ্ণ সুধীরেন্দ্র
মৌলভি আব্দুল মইত কুমুদ চৌধুরী৷
বাবু বিপ্রদাস নাথ সলপেতে বাড়ী৷৷
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বসাইলা মন সাধে
অবসর প্রাপ্ত E.A.C. সুরেশচন্দ্র দাসে৷
তাঁর সম দক্ষ লোক বহু নাই দেশে৷৷
যত কষ্ট কৈলা তাঁরা শ্রীহট্টের ভাগ্য পোড়া
জ্ঞাতি হইতে বিচ্ছিন্ন নির্বান্ধব দেশে৷
শ্রীহট্টের কষ্ট দেখে দুষ্ট লোকে হাসে৷৷
চিরস্থ মহাল প্রতি অসম্ভব কর বৃদ্ধি
করে নাই বঙ্গদেশে বাঙ্গালা সরকার৷
গরীব শ্রীহট্ট রক্ষা কর গবার্ণার৷৷
দেশে জমিদারগণ ঋণ করি সন সন
মাল গুজারী করে কষ্টে সূর্য্য অস্ত দিনে৷

(C) Isan Kothe

দ্বিগুণ হইলে কর দিবে তা কেমনে৷৷
নহি মোরা এক দেশী নহি মোরা এক ভাষী
তালুকে তালুকে বহু আছে বেশ কম৷
শ্রীহট্টে আসামে সখ্য হবে কি কারণ৷৷৭

এই মর্মে সিলেট থেকে দুটি ও কাছাড় থেকে একটি স্মারকপত্র সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল৷ 'হিন্দু হিতৈষিণী', 'বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি পত্রিকা সুরমা উপত্যকাবাসীর দাবী সমর্থন করেছিল৷ এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— "The reaction of the people of Surma Valley to the transfer of their area to Assam was manifestation of the level of political consciousness and an awareness of their identity and their cultural and linguistic affinity with Bengal. Situated in the north-east corner of Bengal, this tiny Valley could be well be described as Ishan Banga (or North-East Bengal) in geographical context, although the state formation processes in the region and the ethnic, linguistic and cultural traits of the population had made it almost inseparable from South-East Bengal. This commonality of heritage prompted the people to react spontaneously to the separation. They could realise the merit of modern system of administration governed by acts and regulations, they appreciated the spirit of New India that was born in Calcutta and they shared the growing national sentiment in the country.৮ সুরমা উপত্যকার সাংস্কৃতিক পরিচিতির সমস্যা নিয়ে পরবর্তী সময়েও আলোচনা হয়েছে৷ রমণীমোহন দাস ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'কমলা'র তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'বঙ্গমিলনে শ্রীহট্ট ব্যাকুল কেন?' প্রবন্ধে এই ব্যাকুলতার কারণ হিসেবে সুরমা উপত্যকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের কথাই আলোচিত হয়েছে৷ প্রবন্ধের উপসংহারে প্রাবন্ধিক লিখেছেন, "আমরা বাঙ্গালী জাতি, নানা কারণে বিড়ম্বিত হইলেও আমরা আমাদের জাতি, আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের সামাজিকতা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের জাতি, গোত্র, বিস্মৃত হইতে পারিব না৷ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের যে অবস্থা গঠিয়াছে এই গেল তাহার কথা৷ শত যাতনার ভিতরে থাকিযাও আমরা যে বাঙ্গালী এ কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না৷

"আমাদের বিশ্বাস ও বিনীত প্রার্থনা যে ন্যায় পরায়ণ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অদূর ভবিষ্যতে শ্রীহট্টবাসী সপ্তবিংশতি লক্ষ নরনারীর এই হৃদয়বেদনা দূর করিতে কখনও কৃপণতা প্রদর্শন করিবে না৷"৯

সংযুক্তিকরণের পর সুরমা উপত্যকার উপভাষার স্বরূপ নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল৷ কোন কোন পণ্ডিত সুরমা উপত্যকার উপভাষাকে অসমীয়া ভাষার অন্তর্গত বলে দাবী করেছিলেন৷ এই পরিপ্রেক্ষিতেই সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব আঞ্চলিক উপভাসার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছিলেন৷ এই বিতর্কের সূত্রে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'শ্রীহট্টীয় কথ্যভাষা' গ্রন্থটি৷১০ এই গ্রন্থে 'শ্রীহট্টে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিতে' নিহিত উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে৷

রাজনৈতিক কাঁটাছেড়া ও ভাষিক বিতর্কের ফলে সুরমা উপত্যকার সাংস্কৃতিক পরিচিতি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল৷ এমতাবস্থায় অঞ্চলটির সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তুলে থরার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তৎকালীন বৌদ্ধিক সমাজ৷ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহিত্যচর্চায় গতি সঞ্চারের প্রয়োজন গঠিত হয়েছিল সুরমা সাহিত্য সম্মিলনী৷

সাহিত্যচর্চাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত

হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। শিলচর অধিবেশনের নবম প্রস্তাব অনুযায়ী ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শ্রীভূমি'।

'শ্রীভূমি' পত্রিকা সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হল ১৯১৫ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে 'শ্রীভূমি' নামে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সুধাংশু গুপ্ত ও আশিস দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় আশ্বিন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'শ্রীভূমি' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'দি সিলেট প্রিন্টার্স' থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটির ঠিকানা ছিল দাড়িয়াপাড়া, শ্রীহট্ট। তবে প্রকাশের পূর্বেই পত্রিকার নাম নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'আমাদের কথা'য় সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন, "পত্রিকার কয়েকজনের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনবোধে তাই নাম পরিবর্তিত হতে পারে। অনেক আগে সিলেট থেকে ক্ষীরোদ দেবের সম্পাদনায় 'শ্রীভূমি' নামেই অন্য একটি পত্রিকা বের হতো। এখন আমারা এই নামেই কোন পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি কি না— এ নিয়ে মতভেদ শুরু হয়েছে। তবে ব্যাপারটা স্বর্গত সম্পাদকের সুযোগ্য পুত্রের সহৃদয়তার উপরই একমাত্র নির্ভর করছে। আশা করি তিনি হতাশ করবেন না আমাদের।"[১১] উক্ত বক্তব্যে ক্ষীরোদ দেবকে 'শ্রীভূমি'র সম্পাদক বলা হয়েছে। 'শ্রীভূমি'র কোন সংখ্যায় সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের তালিকা অনুযায়ী 'শ্রীভূমি'র সম্পাদক দু'জন—সতীশচন্দ্র দেব ও ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব।[১২] ক্ষীরোদচন্দ্র দেব সতীশচন্দ্র দেবের পুত্র।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে প্রকাশিত 'শ্রীভূমি' পাঠকদের তরফ থেকে যথেষ্ট আনুকুল্য লাভ করেছিল। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'নববর্ষ' শিরোনামে মুদ্রিত পরিচালকবর্গের প্রতিবেদনে এর উল্লেখ আছে। তা সত্বেও একবছর আটমাস পরে 'শ্রীভূমি'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সমূহের ইঙ্গিতও উক্ত রচনায় রয়েছে। স্বল্পায়ু হলেও 'শ্রীভূমি' সুরমা উপত্যকায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যে উৎসাহের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা, ৩য় সংস্করণ< অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ২০১৫, পৃ. ১৯।

২. মৌলবি মহাম্মদ আহমদ, শ্রীহট্ট দর্পণ, উৎসব সংস্করণ, উৎস প্রকাশন, ২০০২, পৃ. প্রকাশকের কথা।

৩. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "আমার দেখা মানুষ—মিঃ এ. পোর্টিয়স", 'শিক্ষাসেবক', ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শিলচর, বৈশাখ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

৪. তদেব, পৃ. ৪।

৫. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ), দ্বিতীয় উৎস সংস্করণ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, ভূমিকা, পৃ. ৯।

৬. বিজন ঘোষাল (সমপা), রবীন্দ্র পত্রাভিধান-১, প্রথম সংস্করণ, পত্রলেখা, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৯৪।

৭. জয়নাথ নন্দী মজুমদার, শ্রীহট্ট প্রতিভা (দ্বিতীয় ভাগ), প্রথম সং, শ্রীহট্ট ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪-৩৫।

৮. J. B. Bhattacharjee, "Reaction of the People of Surma Valley to transfer of the Valley to Assam (1874)", 'Proceeding of North East India History Association', Tenth Session, Shillong, 1989, Page-451, 452.

৯. শ্রীহরিকিঙ্কর দাস, "বঙ্গমিলনে শ্রীহট্ট ব্যাকুল কেন?" 'কমলা' ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রীহট্ট, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ. ১৩৪।

১০. শ্রীব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ (সম্পা), শ্রীহট্টীয় কথ্যভাষা, প্রথঙ সং, বড়লেখা, শ্রীহট্ট, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

১১. সম্পাদক, আমাদের কথা, শ্রীভূমি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, দাড়িয়াপাড়া, শ্রীহট্ট, আশ্বিন ১৩৫৪, দ্বিতীয় প্রচ্ছদে মুদ্রিত।

১২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পা), শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র, প্রথম সং, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীহট্ট, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬।

(C) Ishan Kotha

‘সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন’ এর বিভিন্ন অধিবেশনের তালিকা নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী প্রণীত ‘শ্রীহট্ট প্রতিভা’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত (পৃ. ২৩৫-২৩৭)। উক্ত গ্রন্থে কয়েকটি অধিবেশনের তারিখ যথাযথ নয়। সেই সময়কাল পত্রিকা থেকে অধিবেশনগুলির সঠিক তারিখ সংগ্রহ করে দিয়েছেন উইমেন্স কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দেবশ্রী দত্ত।

(C) Ishan Kotha